

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ্য
নদীর
মাঝি



প্রিমিয়াস

পাবলিকেশন্স

পদ্মা নদীর মাঝি
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

©



প্রকাশক

জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ

আবুল ফাতাহ

অঙ্গসজ্জা

শাহরিয়ার হাসান

প্রকাশনী

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন

ঠিকানা: বাংলাবাজার, ঢাকা

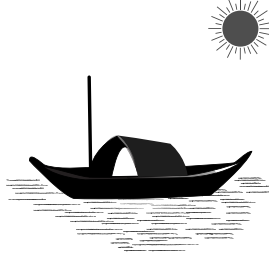
বইমেলা পরিবেশক

নয়া উদ্যোগ

PADMA NODR MAJHI by *Manik Bandyopadhyay*
Published by **Premium Publication** Banglabazar, Dhaka
Email : premiumpublications4@gmail.com



পাবলিকেশন্স
প্রিমিটি



বর্ষার মাঝামাঝি

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষে রহস্যময় স্তান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মতো সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেলস্টেশনে ও জাহাজঘাটে শান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা-ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরো দুজন লোক আছে। ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিন জনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে।

আরো দু মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশি বড় নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিন জনে কোনোরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমের বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষ সীমায় বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশে বাঁধা জাল লাগে।

দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দাড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নিচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

এই নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে। পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিন্দ্রি আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয়

নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে। নৌকা শ্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার একেবারে ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জের মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না। সকলেরই যদি এরকম মাছ পড়ে, দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেষ কোনো লাভের আশা থাকিবে না। তবে বড় মাছের বড় ঝাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না, এই যা ভরসার কথা। বেশি মাছ সকলের নাও উঠিতে পারে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, ‘যদু হে এ এ এ-মাছ কিবা?’

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, ‘জবর।’

জবরের পর সে নৌকা হইতে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাহাদের মাছ পড়িতেছে জবর!

ধনঞ্জয় বলে, ‘সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।’

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, ‘কাইল চাইরে নামব। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।’

কুবের কিছু বলে না। ঝপ্ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।

শরীরটা আজ তাহার ভালো ছিল না। তাহার স্ত্রী মালা তাহাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারো সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তাহার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত

বছর তাহাকে এমনি ভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে যে সে তাহার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যাহারা পাতিতে পারে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় যদুর জোড়াতালি-দেওয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে তার দু-তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এই ইলিশের মরসুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।

মাঝরাতে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, ‘একটু জিরাই গো আজান খুড়া।’

‘জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িৎ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।’

কুবের বলিল, ‘উঁহু, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখানা জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভালো নাই।’

জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কঙ্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল-ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বার বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

একহাতে তীরের দিকে কোনাকুনি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ‘দে কুবের, আমারে দে, ধরাই।’

কলিকাটি তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্য সত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, ‘ইঃ, আজ কি জাড় কুবির।’

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারো সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আবার বলিল, ‘জানস কুবির, আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।’

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তাহার অত্যন্ত শুথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সে কোনো কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না এইটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বার বার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মতো করিয়া যদি কেহ তার কথার জবাব দেয় তাহাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এই আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা। আছে, সুখদুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া

দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল ।

গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, 'একখান গীত ক দেখি কুবির ।'

'হ, গীত না তর মাথা ।'

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল । তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান । সে গাহিতে পারে না । কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না । ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে । যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এই গভীর সমস্যার কথা আছে । বড় সহজ গান নয় ।

পুবদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল । তারপর রওনা হইল জাহাজঘাটের দিকে । সেইখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারদিক আলো হইয়া উঠিল ।

নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । থাকিয়া থাকিয়া স্টিমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে । সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোনো স্টিমার ছাড়িয়া যায়, কোনো স্টিমার ভেড়ে গিয়া জেটিতে । কলিকাতা হাইতে ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে । ঘাটের ও স্টেশনের দোকানপাট সমস্ত খোলা হইয়াছে । অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে । মোটরবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটবড় নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে । ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায়- পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরো যে কত নৌকা তাহার সংখ্যা নাই ।

নদীতে শুধু জলের স্রোত । জলে-স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ । মেছো-নৌকার ঘাটটি একপাশে । ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে । হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম । অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চলিতেছে । চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই ।

এই ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষ রাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধহয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটো যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচ বারের বেশি।

নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোট ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। এক শ মাছ গোনা হইবামাত্র তাহার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাস্ত্রে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে একসারি মাছ ও এক পরত করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানবাবুর ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে মেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উঁচুনিচু ও প্রায় একেজো লাইনের উপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ। একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, ‘কী কন?’

সে রাগ করিয়া বলিল, ‘কী কন! কী জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।’

‘মাছ তো নাই শেতলবাবু।’

‘নাই কি রে, নাই? রোজ আমরাে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে আয় গা, যা। বড় দেইখা আনিস।’

কুবের মাথা নাড়িল, ‘আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়ো সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।’

কিঞ্চ কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার দ্বিগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।

সে মিনতি করিয়া বলিল, ‘তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশিই লইস, আঁই?’

‘তালি খানিক দাঁড়াও শেতলবাবু।’

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপিচুপি মাছ লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জায় তাহার সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এই যে সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারো নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটা মাছ কুবের এক সময় কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ ক’টা সে চটের খলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

‘পয়সা কাইল দিমু কুবের।’

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, ‘রন শেতলবাবু, অমন তুরা কইরা যাইবেন না। দামটা দ্যান দেখি।’

‘কাইল দিমু কইলাম যে।’

‘অঁই অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?’

‘পয়সা নাই ত দিমু কি? কাল দিমু, নিযাস দিমু।’

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরজু চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল ‘হালা ডাকাইত!’ বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরো কয়টা গাল দিয়া কুবের নৌকায় গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয় তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল। একা একা দাম লইবার সুযোগ সে কোনোদিনই পায় না। কুবের এই সময়টা জোকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। টাকা পাওয়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, ‘কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ-চারের কম না, অ্যা?’

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, ‘হ চাইর শ না হাজার। দুই শ সাতপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াই শর দাম দিছে।’

কুবের উঠিয়া বসিল।

‘ইটা কি কও খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুই শ সাতাইশটা মাছ হইছিল?’

ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, ‘মিছা কইলাম নাকি রে কুবের? জিগাইস না, গণেশ আইলে জিগাইস।’

কুবের নরম হইয়া বলিল, ‘জিগানের কাম কী? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না! মাছ নি কাল বেশি বেশি পড়ছিল তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।’

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন-পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা

সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে সে। প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।

গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাঠাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখন বৈঠা না ধরিলেও চলে। উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়ে শুকনা চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা চেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কাক চিল মাছরাঙা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে মাছ ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট সঙ্কেতের মতো একটি স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই।

গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, ‘না আইলি পারতি কুবির আইজ।’ কুবের কোনো জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।

গণেশ বলে, ‘মাথাটা টিপা দিম্মু নাকি?’

কুবের বলে, ‘অঁ হঁ।’

গণেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলে, ‘হাল ধইরা যদি বাইবার পারস কুবির, খুড়া আর আমি বৈঠা বাই, তাড়াতাড়ি পৌছান যায়।’

পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সঙ্কীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল

ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাজ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ।

বর্ষাকালে চারিদিক জলে-জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়িঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ পাড়া হইতে ও পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েক দিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরো এক মাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এ দেশে একরকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।

নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল-কাটা রিজুতা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।

নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজো মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনোদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।

জেলেপাড়া নদী হইতে বেশি দূরে নয়। তবু এইটুকু পথ চলিতেই কুবেরের কষ্ট হইতেছিল। নৌকায় সমস্ত পথটা আবোল-তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চূপ করিয়াছে। ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশের কুটুমবাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা লইয়া সে একাই সেখানে চলিয়া গিয়াছে।

গণেশের বাড়িটাই পড়ে আগে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

নকুল দাস ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

কুবেরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিল, ‘অ কুবির, শোন, শুইনা যা।’

গণেশ বলিল, ‘কুবির জ্বরে বড় কাতর গো।’

নকুল বলিল, ‘জ্বর নাকি? তবে যা, বাড়িৎ যা। দ্যাখ গিয়া বাড়িতে কী কাণ্ড হইয়া আছে।’

এমন কথা শুনিয়া ব্যাপারটা না জানিয়া যাওয়া চলে না। কুবের উদ্ভিগ্ন হইয়া বলিল, ‘কিসের কাণ্ড নকুলদা?’

‘শ্যাম রাইতে তর বৌ খালাস হইছে কুবির।’

কুবের অবাক হইয়া বলিল, ‘হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিন গেছে নকুলদা। ইটা হইল কিবা?’

‘ক্যান? নয় মাসে খালাস হয় না?’

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘পুরুষ ছাওয়াল হইছে না?’

নকুল সায় দিয়া বলিল, ‘হ। আমাগোর পাচী গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্রর আইছে বাবা, ওই একরন্ডি একখানা পোলা, তার চাঁদপানা মুখের কথা কী কম। রং হইছে গোরা!’

কুবেরের স্তিমিত চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, ‘তুই ত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।’

গণেশ রাগিয়া বলিল, ‘বৌ গোরা না নকুলদা?’

‘হ, বৌ ত গোরাই, হ।’

এর বাড়ির পিছন দিয়া ওর বাড়ির উঠান দিয়া কুবের ও গণেশ এবার একটু জোরে জোরে পা ফেলিয়াই বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল।

গণেশ ভারি খুশি। বার বার সে বলিতে লাগিল, ‘পোলা হইব কই নাই কুবির? কই নাই ইবার তর পোলা না হইয়া যায় না?’

শেষে বিরক্ত হইয়া কুবের বলিল, ‘চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুণ কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা!’

গণেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, ‘তুই নি গোসা করিস কুবির?’
‘করুণ না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?’

তাহার মেজাজের এই আকস্মিক উত্তাপ গণেশের কাছে বড়ই দুর্বোধ্য ঠেকিল। অত তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার, হিসাব করিবার ক্ষমতা নাই। বৌ থাকিলে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে হয় এই পর্যন্ত সে জানে, সুবিধা অসুবিধার কথাটা ভাবিয়া দেখে না। তাছাড়া পৃথিবীতে মানুষ আসিলে তাহাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যে মানুষের নয়, যিনি জীব দেন তাঁর, গণেশ এটা বিশ্বাস করে। সুতরাং ছেলে হওয়ার সংবাদে কুবেরের রাগ করিবার কি কারণ আছে সে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার চেষ্টাও করিল না।

বেড়া-দেওয়া ছোট একটি উঠানের দু’দিকে দুখানা ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশি পরিচয় নাই। এদিকে ঘরের সঙ্কীর্ণ দাওয়া একটা ছেঁড়া মাদুর চট প্রভৃতি দিয়া ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় ওটি আঁতুড়ঘর। কারণ চটের ফাঁক দিয়া ভিতরে শায়িতা মালাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কুবের ওদিকের দাওয়াবিহীন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা-দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চোকি-সমান উঁচু বাঁশের বাতা- বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসি এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়িকলসীতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের

এতগুলি হাঁড়িকলসী কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নিচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বার বার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল সেচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তারপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা টেকি কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈরি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবের মতো চিতার আগুনের সামান্যতম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই টেকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কুবের তখন ছোট, পদ্মানদীর মাঝির ছেলে যতটুকু বয়সে পদ্মায় সাঁতার দিবার মতো পাকা সাঁতার হইয়া উঠিতে পারে না, তত ছোট। ছোট একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝি পুরোনো নৌকার তলাটা হঠাৎ কি করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ-তীরের ও-তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুক করিয়া মানুষ করিয়াছে পদ্মার বুক যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে ওঠা তার পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড় এবং শক্তসমর্থ হইলেও সে বিপদে পড়িত না। কিন্তু ছেলেমানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন যে লম্বা কাঠের গুঁড়িটা হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু

কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই, ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া দিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।

কুবেরের পিসি আর তার বড় মেয়ে গোপী কুবেরকে দেখিয়াই চেষ্টামেচি করিয়া কাছে আসিয়াছিল। কুবের কারো সঙ্গে কথা বলিল না। লম্বা হইয়া পিসির বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পিসি বলিল, ‘শুধি যে ধন? বৌ ওদিকে পোলা বিয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়।’

গোপী বলিল, ‘বাই উ, ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইয়াছে বাবা। নকুলার মাইয়া পাচী কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয় না। না পিসি?’

কুবের চেষ্টাইয়া ধমক দিয়া বলিল, ‘নকুইলা কি লো হারামজাদী? জ্যাঠা কইবার পার না?’

গোপী মুখ ভার করিয়া বলিল, ‘ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?’

‘কী কয়?’

‘রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগো বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদলা পাক্ দিমুনে দুইড়া মুখের মধ্যে।’

‘দিস’, বলিয়া কুবের ঝিমাইতে থাকে। খানিক পরে কুবেরের দাওয়া হইতে শিশুর জোরালো কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয় ছেলেটা আগেভাগে আসিয়া পড়িলেও গলায় রীতিমতো জোর করিয়া আসিয়াছে। চেষ্টাইতে পারে।